আল ফাতিহা

১

নামকরণ

এ সূরার মূল বিষয়বস্তুর সাথে সামঞ্জস্য রেখেই এর এই নামকরণ করা হয়েছে। যার সাহায্যে কোন বিষয়, গ্রন্থ বা জিনিসের উদ্বোধন করা হয় তাকে 'ফাতিহা' বলা হয়। অন্য কথায় বলা যায়, এ শব্দটি ভূমিকা এবং বক্তব্য শুরু করার অর্থ প্রকাশ করে।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

এটি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুওয়াত লাভের একেবারেই প্রথম যুগের সূরা। বরং হাদীসের নির্ভরযোগ্য বর্ণনা থেকে জানা যায়, এটিই মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর নাযিলকৃত প্রথম পূর্ণাংগ সূরা। এর আগে মাত্র বিচ্ছিন্ন কিছু আয়াত নাযিল হয়েছিল। সেগুলো সূরা 'আলাক', সূরা 'মুয্যাম্মিল' ও সূরা 'মুদ্দাস্সির' ইত্যাদিতে সন্নিবেশিত হয়েছে।

বিষয়বস্তু

আসলে এ সূরাটি হচ্ছে একটি দোয়া। যে কোন ব্যক্তি এ গ্রন্থটি পড়তে শুরু করলে আল্লাহ প্রথমে তাকে এ দোয়াটি শিখিয়ে দেন। গ্রন্থের শুরুতে এর স্থান দেয়ার অর্থই হচ্ছে এই যে, যদি যথার্থই এ গ্রন্থ থেকে তুমি লাভবান হতে চাও, তাহলে নিখিল বিশ্ব-জাহানের মালিক আল্লাহর কাছে দোয়া এবং সাহায্য প্রার্থনা করো।

মানুষের মনে যে বস্তুটির আকাংখা ও চাহিদা থাকে স্বভাবত মানুষ সেটিই চায় এবং সে জন্য দোয়া করে। আবার এমন অবস্থায় সে এই দোয়া করে যখন অনুভব করে যে, যে সত্তার কাছে সে দোয়া করছে তার আকাংখিত বস্তুটি তারই কাছে আছে। কাজেই কুরআনের শুরুতে এই দোয়ার শিক্ষা দিয়ে যেন মানুষকে জানিয়ে দেয়া হয়েছে, সত্য পথের সন্ধান লাভের জন্য এ গ্রন্থটি পড়, সত্য অনুসন্ধানের মানসিকতা নিয়ে এর পাতা ওলটাও এবং নিখিল বিশ্ব-জাহানের মালিক ও প্রভু আল্লাহ হচ্ছেন জ্ঞানের একমাত্র উৎস—একথা জেনে নিয়ে একমাত্র তাঁর কাছেই পথনির্দেশনার আর্জি পেশ করেই এ গ্রন্থটি পাঠের সূচনা কর।

এ বিষয়টি অনুধাবন করার পর একথা সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, কুরআন ও সূরা ফাতিহার মধ্যকার আসল সম্পর্ক কোন বই ও তার ভূমিকার সম্পর্কের পর্যায়ভুক্ত নয়। বরং এ সম্পর্কটি দোয়া ও দোয়ার জবাবের পর্যায়ভুক্ত। সূরা ফাতিহা বান্দার পক্ষ থেকে একটি দোয়া। আর কুরআন তার জবাব আল্লাহর পক্ষ থেকে। বান্দা দোয়া করে, হে মহান প্রভু! আমাকে পথ দেখাও। জবাবে মহান প্রভু এই বলে সমগ্র কুরআন তার সামনে রেখে দেন —এই নাও সেই হিদায়াত ও পথের দিশা যে জন্য তুমি আমার কাছে আবেদন জানিয়েছ।

আয়াত ৭ | সূরা আল ফাতিহা–মক্কী | রুকূ' ১

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় মেহেরবান আল্লাহর নামে[১]

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝١ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝٢ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۝٣ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۝٤

প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর জন্য[২] *যিনি নিখিল বিশ্ব–জাহানের রব,*[৩] *পরম দয়ালু ও করুণাময়,*[৪] *প্রতিদান দিবসের মালিক।*[৫]

আমরা একমাত্র তোমারই ইবাদাত করি[৬] *এবং একমাত্র তোমারই কাছে সাহায্য চাই।*[৭]

১. ইসলাম মানুষকে একটি বিশেষ সভ্যতা ও সংস্কৃতি শিক্ষা দিয়েছে। প্রত্যেকটি কাজ শুরু করার আগে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা সভ্যতা ও সংস্কৃতির একটি রীতি। সচেতনতা ও আন্তরিকতার সাথে এ রীতির অনুসারী হলে অনিবার্যভাবে তিনটি সুফল লাভ করা যাবে। এক ঃ মানুষ অনেক খারাপ কাজ করা থেকে নিষ্কৃতি পাবে। কারণ আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা অভ্যাস তাকে প্রত্যেকটি কাজ শুরু করার আগে একথা চিন্তা করতে বাধ্য করবে যে, যথার্থই এ কাজে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করার কোন ন্যায়সংগত অধিকার তার আছে কি না? দুই ঃ বৈধ সঠিক ও সৎকাজ শুরু করতে গিয়ে আল্লাহর নাম নেয়ার কারণে মানুষের মনোভাব ও মানসিকতা সঠিক দিকে মোড় নেবে। সে সবসময় সবচেয়ে নির্ভুল বিন্দু থেকে তার কাজ শুরু করবে। তিন ঃ এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় সুফল হচ্ছে এই যে, আল্লাহর নামে যখন সে কাজ শুরু করবে তখন আল্লাহর সাহায্য, সমর্থন ও সহায়তা তার সহযোগী হবে। তার প্রচেষ্টায় বরকত হবে। শয়তানের বিপর্যয় ও ধ্বংসকারিতা থেকে তাকে সংরক্ষিত রাখা হবে। বান্দা যখন আল্লাহর দিকে ফেরে তখন আল্লাহও বান্দার দিকে ফেরেন, এটাই আল্লাহর রীতি।

২. ইতিপূর্বে ভূমিকায় বলেছি, সূরা ফাতিহা আসলে একটি দোয়া। তবে যে সত্তার কাছে আমরা প্রার্থনা করতে চাচ্ছি তাঁর প্রশংসা বাণী দিয়ে দোয়া শুরু করা হচ্ছে। এভাবে যেন দোয়া চাওয়ার পদ্ধতি শিক্ষা দেয়া হচ্ছে। অর্থাৎ দোয়া চাইতে হলে ভদ্র ও শালীন পদ্ধতিতে দোয়া চাইতে হবে। কারো সামনে গিয়ে মুখ খুলেই প্রথমে নিজের প্রয়োজনটা পেশ করে দেয়া কোন সৌজন্য ও ভব্যতার পরিচায়ক নয়। যার কাছে প্রার্থনা করা হচ্ছে প্রথমে তার গুণাবলী বর্ণনা করা এবং তার দান, অনুগ্রহ ও মর্যাদার স্বীকৃতি দেয়াই ভদ্রতার রীতি।

আমরা দু'টি কারণে কারো প্রশংসা করে থাকি। প্রথমত তিনি প্রকৃতিগতভাবে কোন বিশেষ শ্রেষ্ঠত্ব ও গুণ-বৈশিষ্টের অধিকারী। তাঁর ঐ শ্রেষ্ঠত্ব ও গুণ-বৈশিষ্ট আমাদের ওপর কি প্রভাব ফেলে সেটা বড় কথা নয়। দ্বিতীয়ত তিনি আমাদের প্রতি অনুগ্রহকারী এবং আমরা তাঁর অনুগ্রহের স্বীকৃতির আবেগে উচ্ছ্বসিত হয়েই তাঁর গুণাবলী বর্ণনা করি। মহান আল্লাহর প্রশংসা এই উভয় কারণে ও উভয় দিক দিয়েই করতে হয়। আমরা হামেসা তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হব, এটি তাঁর অপরিসীম মর্যাদা ও আমাদের প্রতি তাঁর অশেষ অনুগ্রহের দাবী।

আর প্রশংসা আল্লাহর জন্য, কেবল এখানেই কথা শেষ নয় বরং সঠিকভাবে বলা যায়, "প্রশংসা একমাত্র আল্লাহরই" জন্য। একথাটি বলে একটি বিরাট সত্যের ওপর থেকে আবরণ উঠিয়ে নেয়া হয়েছে। আর এটি এমন একটি সত্য যার প্রথম আঘাতেই 'সৃষ্টি পূজা'র মূলে কুঠারাঘাত হয়। দুনিয়ায় যেখানে যে বস্তুর মধ্যে যে আকৃতিতেই কোন সৌন্দর্য, বৈশিষ্ট ও শ্রেষ্ঠত্ব বিরাজিত আছে আল্লাহর সত্তাই মূলত তার উৎস। কোন মানুষ, ফেরেশতা, দেবতা, গ্রহ-নক্ষত্র তথা কোন সৃষ্টির নিজস্ব কোন গুণ-বৈশিষ্ট শ্রেষ্ঠত্ব নেই। বরং এসবই আল্লাহ প্রদত্ত। কাজেই যদি কেউ এ অধিকার দাবী করেন যে, আমরা তাঁর প্রশংসা কীর্তন করব, তাঁকে পূজা করব, তাঁর অনুগ্রহ স্বীকার করব ও তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ থাকব এবং তাঁর খেদমতগার ও সেবক হব, তাহলে তিনি হবেন সেই শ্রেষ্ঠত্ব ও গুণ-বৈশিষ্টের স্রষ্টা ঐ শ্রেষ্ঠত্ব ও গুণ-বৈশিষ্টের অধিকারী মানব-সত্তা নয়।

৩. 'রব' শব্দটিকে আরবী ভাষায় তিনটি অর্থে ব্যবহার করা হয়। এক, মালিক ও প্রভু। দুই, অভিভাবক, প্রতিপালনকারী, রক্ষণাবেক্ষণকারী ও সংরক্ষণকারী। তিন, সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী, শাসনকর্তা পরিচালক ও সংগঠক।

৪. মানুষের দৃষ্টিতে কোন জিনিস খুব বেশী বলে প্রতীয়মান হলে সেজন্য সে এমন শব্দ ব্যবহার করে যার মাধ্যমে আধিক্যের প্রকাশ ঘটে। আর একটি আধিক্যবোধক শব্দ বলার পর যখন সে অনুভব করে যে ঐ শব্দটির মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট জিনিসটির আধিক্যের প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি তখন সে সেই একই অর্থে আর একটি শব্দ ব্যবহার করে। এভাবে শব্দটির অন্তরনিহিত গুণের আধিক্য প্রকাশের ব্যাপারে যে কমতি রয়েছে বলে সে মনে করছে তা পূরণ করে। আল্লাহর প্রশংসায় 'রহমান' শব্দের পরে আবার 'রহীম' বলার মধ্যেও এই একই নিগূঢ় তত্ত্ব নিহিত রয়েছে। আরবী ভাষায় 'রহমান' একটি বিপুল আধিক্যবোধক শব্দ। কিন্তু সৃষ্টির প্রতি আল্লাহর রহমত ও মেহেরবানী এত বেশী ও ব্যাপক এবং এত সীমাসংখ্যাহীন যে, তা বয়ান করার জন্য সবচেয়ে বেশী ও বড় আধিক্যবোধক শব্দ ব্যবহার করার পরও মন ভরে না। তাই তার আধিক্য প্রকাশের হক আদায় করার জন্য আবার 'রহীম' শব্দটিও বলা হয়েছে। এর দৃষ্টান্ত এভাবে দেয়া যেতে পারে, যেমন আমরা কোন ব্যক্তির দানশীলতার গুণ বর্ণনা করার জন্য 'দাতা' বলার পরও যখন অতৃপ্তি অনুভব করি তখন এর সাথে 'দানবীর' শব্দটিও লাগিয়ে দেই। রঙের প্রশংসায় 'সাদা' শব্দটি বলার পর আবার 'দুধের মতো সাদা' বলে থাকি।

৫. অর্থাৎ যেদিন মানবজাতির পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সমস্ত বংশধরদেরকে একত্র করে তাদের জীবনের সমগ্র কর্মকাণ্ডের হিসেব নেয়া হবে। প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার পূর্ণ কর্মফল দেয়া হবে। তিনি সেই দিনের একচ্ছত্র অধিপতি, আল্লাহর প্রশংসায় রহমান ও রহীম শব্দ

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۝٥ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ
عَلَيْهِمْ ۝٦ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۝٧

তুমি আমাদের সোজা পথ দেখাও,[৮] তাদের পথ যাদের প্রতি তুমি অনুগ্রহ করেছ,[৯] যাদের ওপর গযব পড়েনি এবং যারা পথভ্রষ্ট হয়নি।[১০]

ব্যবহার করার পর তিনি প্রতিদান দিবসের মালিক একথা বলায় এখান থেকে এ অর্থও প্রকাশিত হয় যে, তিনি নিছক দয়ালু ও করুণাময় নন বরং এই সংগে তিনি ন্যায় বিচারকও। আবার তিনি এমন ন্যায় বিচারক যিনি হবেন শেষ বিচার ও রায় শুনানীর দিনে পরিপূর্ণ ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের মালিক সেদিন তিনি শাস্তি প্রদান করলে কেউ তাতে বাধা দিতে পারবে না। এবং পুরস্কার দিলেও কেউ ঠেকাতে পারবে না। কাজেই তিনি আমাদের প্রতিপালন করেন ও আমাদের প্রতি করুণা করেন এ জন্য যে আমরা তাঁকে ভালোবাসি শুধু এতটুকুই নয় বরং তিনি ইনসাফ ও ন্যায় বিচার করেন এ জন্য আমরা তাঁকে ভয়ও করি এবং এই অনুভূতিও রাখি যে, আমাদের পরিণামের ভালো মন্দ পুরোপুরি তাঁরই হাতে ন্যস্ত।

৬. ইবাদাত শব্দটিও আরবী ভাষায় তিনটি অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। (১) পূজা ও উপাসনা করা, (২) আনুগত্য ও হুকুম মেনে চলা এবং (৩) বন্দেগী ও দাসত্ব করা। এখানে একই সাথে এই তিনটি অর্থই প্রকাশিত হয়েছে। অর্থাৎ আমরা তোমার পূজা–উপাসনা করি, তোমার আনুগত্য করি এবং তোমার বন্দেগী ও দাসত্বও করি। আর আমরা তোমার সাথে এ সম্পর্কগুলো রাখি কেবল এখানেই কথা শেষ নয় বরং এ সম্পর্কগুলো আমরা একমাত্র তোমারই সাথে রাখি। এই তিনটি অর্থের মধ্যে কোন একটি অর্থেও অন্য কেউ আমাদের মাবুদ নয়।

৭. অর্থাৎ তোমার সাথে আমাদের সম্পর্ক কেবল ইবাদাতের নয় বরং আমাদের সাহায্য প্রার্থনার সম্পর্কও একমাত্র তোমারই সাথে রয়েছে। আমরা জানি তুমিই সমগ্র বিশ্ব–জাহানের রব। সমস্ত শক্তি তোমারই হাতে কেন্দ্রীভূত। তুমি একাই যাবতীয় নিয়ামত ও অনুগ্রহের অধিকারী। তাই আমাদের অভাব ও প্রয়োজন পূরণের জন্য আমরা একমাত্র তোমারই দুয়ারে ধর্ণা দেই। তোমারই সামনে নিজেদের সুপর্দ করে দেই এবং তোমারই সাহায্যের ওপর নির্ভর করি। এ জন্য আমাদের এই আবেদন নিয়ে আমরা তোমার দুয়ারে হাজির হয়েছি।

৮. অর্থাৎ জীবনের প্রত্যেকটি শাখা প্রশাখায় এবং প্রত্যেকটি বিভাগে, চিন্তা, কর্ম ও আচরণের এমন বিধি–ব্যবস্থা আমাদের শেখাও, যা হবে একেবারেই নির্ভুল, যেখানে ভুল দেখা, ভুল কাজ করা ও অশুভ পরিণামের আশংকা নেই, যে পথে চলে আমরা যথার্থ সাফল্য ও সৌভাগ্যের অধিকারী হতে পারি। কুরআন অধ্যয়নের প্রাক্কালে বান্দা তার প্রভু, মালিক, আল্লাহর কাছে এই আবেদনটি পেশ করে। বান্দা আর্জি পেশ করে, হে আল্লাহ! তুমি আমাদের পথ দেখাও। কল্পিত দর্শনের গোলকধাঁধার মধ্য থেকে যথার্থ সত্যকে

উন্মুক্ত করে আমাদের সামনে তুলে ধর। বিভিন্ন নৈতিক চিন্তা–দর্শনের মধ্য থেকে যথার্থ ও নির্ভুল নৈতিক চিন্তা–দর্শন আমাদের সামনে উপস্থাপিত কর। জীবনের অসংখ্য পথের মধ্য থেকে চিন্তা ও কর্মের সহজ, সরল ও সুস্পষ্ট রাজপথটি আমাদের দেখাও।

৯. মহান আল্লাহর কাছ থেকে আমরা যে সোজা পথটির জ্ঞান লাভ করতে চাচ্ছি এটা হচ্ছে তার পরিচয়। অর্থাৎ এমন পথ যার ওপর সবসময় তোমার প্রিয়জনেরা চলেছেন। সেই নির্ভুল রাজপথটি অতি প্রাচীনকাল থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত যে ব্যক্তি ও যে দলটিই তার ওপর চলেছে সে তোমার অনুগ্রহ লাভ করেছে এবং তোমার দানে তার জীবনপাত্র পরিপূর্ণ হয়েছে।

১০. অর্থাৎ 'অনুগ্রহ' লাভকারী হিসেবে আমরা এমন সব লোককে চিহ্নিত করিনি যারা আপাতদৃষ্টিতে সাময়িকভাবে তোমার পার্থিব অনুগ্রহ লাভ করে থাকে ঠিকই কিন্তু আসলে তারা হয় তোমার গযব ও শাস্তির অধিকারী এবং এভাবে তারা নিজেদের সাফল্য ও সৌভাগ্যের পথ হারিয়ে ফেলে। এ নেতিবাচক ব্যাখ্যায় একথা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, 'অনুগ্রহ' বলতে আমরা যথার্থ ও স্থায়ী অনুগ্রহ বুঝাচ্ছি, যা আসলে সঠিক পথে চলা ও আল্লাহর সন্তোষ লাভের ফলে অর্জিত হয়। এমন কোন সাময়িক ও লোক দেখানো অনুগ্রহ নয়, যা ইতিপূর্বে ফেরাউন, নমরূদ ও কারূনরা লাভ করেছিল এবং আজো আমাদের চোখের সামনে বড় বড় যালেম, দুষ্কৃতিকারী ও পথভ্রষ্টরা যেগুলো লাভ করে চলেছে।